Vol. 49 | No. 3 | 2012

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

রবীন্দ্রকবিতার অন্তরাগ

Volume	49
Issue	3
Year	2012
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Tarana Nupur
Published online	June 1, 2012
DOI	10.62328/sp.v49i3(2).10
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v49i3(2).10
Pages	181-204
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

রবীন্দ্রকবিতার অন্তরাগ

তারানা নূপুর*

Check for updates

রবীন্দ্র-সৃষ্টির অন্ত্যপর্ব কাব্যপ্রধান নয়, বরং চিত্রকলা ও নৃত্য মাধ্যমে রূপমুখ্য। রবীন্দ্রনাথ অঙ্কিত চিত্রকর্মসমূহ, নৃত্যনাট্যত্রয়–*চিত্রাঙ্গদা (১৯৩৬), চণ্ডালিকা (১৯৩৮), শ্যামা* (১৯৩৯) এবং গীতিনাট্যগুলো এ পর্যায়ে রবীন্দ্র-প্রবর্তনার অন্যতম স্বাক্ষর। ফলে শেষপর্বের রবীন্দ্রসৃষ্টি সাহিত্য অপেক্ষা শিল্পেই অধিকতর স্বচ্ছন্দ — সেখানে ভাব অপেক্ষা প্রকাশ এবং তদপেক্ষা পরিবেশনা গুরুত্বপূর্ণ — নির্বস্তুকতা অপেক্ষা রূপাশ্রয়িতা মুখ্য। তবে, অন্ত্যপর্বের রবীন্দ্রকাব্যও কম বিচিত্র নয়। বিশেষত *প্রান্তিক* (১৯৩৭) থেকে রবীন্দ্রকাব্যে ঘটে অভাবনীয় পরিবর্তন — যেন জন্মান্তর সাধিত হয় রবীন্দ্র-মানসে ও চিন্তাজগতে। *প্রান্তিক* থেকে *শেষ লেখা* (১৯৪১) পর্যন্ত রবীন্দ্রকাব্যের অন্তপর্ব এই নবজাত ভাবের অনুষঙ্গী।

১৯৩৭ সালের ১০ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনাথ জটিল 'বিসর্প' ব্যাধিতে (ইরিসিপেলাস) আক্রান্ত হয়ে হতচেতন হয়ে পড়েন। দুইদিন সংজ্ঞালুপ্ত থাকার পর চৈতন্য লাভ করেন [প্রভাতকুমার, ১৪১১ : ১০৬]। চেতনাহীন অবস্থায় তাঁর গভীর অবচেতনে কবি যে রহস্য প্রত্যক্ষ করেন তাই ব্যক্ত হয় *প্রান্তিক* কাব্যে। দুঃস্বপ্নের তলে তলে এক অসাধারণ রোমাঞ্চ ও গতি অনুভব করেন তিনি। কবির মনে হয়, মৃত্যুর ঘনায়মান অন্ধকার যখন ক্রমশ আচ্ছাদন করে তাঁর চৈতন্য, ঠিক সেই মুহূর্তে শূন্য থেকে আগত কোনো এক জ্যোতির্ময় তর্জনীর স্পর্শে মুহূর্তে ছিন্ন হয়ে যায় পুঞ্জীভূত ঘন অন্ধকার — কবির ধমনীতে বিদ্যুদ্গতিতে প্রবাহিত হয় আলোকতরঙ্গ — গ্রীষ্মের শুষ্ক নদীর বুকে অকস্মাৎ প্রবাহিত খরধারার মতো —

> কোন্ ক্ষণে নটলীলা-বিধাতার নবনাট্যভূমে
> উঠে গেল যবনিকা। শূন্য হতে জ্যোতির তর্জনী
> স্পর্শ দিল এক প্রান্তে স্তম্ভিত বিপুল অন্ধকারে,
> আলোকের খরহর শিহরন চমকি চমকি
> ছুটিল বিদুৎবেগে অসীম তন্দ্রার স্তূপে স্তূপে,
> দীর্ণ দীর্ণ করি দিল তারে! গ্রীষ্মরিক্ত অবলুপ্ত
> নদীপথে অকস্মাৎ প্লাবনের দুরন্ত ধারায়
> বন্যার প্রথম নৃত্য শুষ্কতার বক্ষে বিসর্পিয়া
> ধায় যথা শাখায় শাখায়—সেইমত জাগরণ
> শূন্য আঁধারের গূঢ় নাড়ীতে নাড়ীতে অন্তঃশীলা
> জ্যোতির্ধারা দিল প্রবাহিয়া। (১ সংখ্যক কবিতা, *প্রান্তিক*)

তারপর কবির চেতনায় সৃষ্টি হয় এক বিভ্রম — অন্ধকার থেকে আলোতে আসার ধাঁধা। বিভ্রমাবসানে কবি নিজের মধ্যে উপলব্ধি করেন এক নতুন জীবন — যেন নতুন সৃষ্টিপর্বে নতুন অভ্যুদিত কোনো প্রাণ। কবির অতীতের বিন্ধ্যরূপ জীর্ণ প্রাণ মুহূর্তে চূর্ণ হয়ে প্রভাতের অবসন্ন মেঘের মতো হয়ে যায় নির্ভার, দিগন্তচ্যুত। সেই ধ্বংস-তটে দাঁড়িয়ে পুনর্জীবিত

*সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল।

কবি উপনীত হন এক 'আলোকতীর্থে'। আগন্তুক কবির সত্তায় সঞ্চারিত হয় আদিম সৃষ্টি-যুগের প্রকাশের আনন্দ। মৃত্যু-ফেরত কবি মৃত্যুর প্রসাদে একদিকে হয়ে ওঠেন রিক্ত, শূন্য, নিঃসঙ্গ, নিরাসক্ত; অন্যদিকে পুরনো জীবন ও কর্মের সাথে তাঁর নতুন জীবনের এক স্পষ্ট ছেদ সাধিত হয় —

পুরাতন আপনার ধ্বংসোন্মুখ মলিন জীর্ণতা
ফেলিয়া পশ্চাতে, রিক্তহস্তে মোরে বিরচিতে হবে
নূতন জীবনচ্ছবি শূন্য দিগন্তের ভূমিকায়। (৩ সংখ্যক কবিতা, *প্রান্তিক*)

এ যেন আপন সত্তা থেকে স্খলিত হয়ে নতুন পরিচয়ে জন্মলাভ। রূপান্তরিত কবির দুই জীবন হয়ে যায় সৃষ্টির দুই তট। নতুন তটে দাঁড়িয়ে কবির মনে হয় — কালিন্দীর স্রোতে ভেসে যায় তাঁর দেহ — পুরনো অনুভূতি আর স্মৃতির সঞ্চয় নিয়ে— ক্রমশ ক্ষীয়মানরূপে বিলুপ্ত হয় বিস্মৃতির তটে। আর নতুন তটে দাঁড়িয়ে কবি নতুন প্রাণশক্তি ও কর্মোদ্দীপনা নিয়ে সূর্যের সাথে একাত্ম হতে চান — বোধ করেন সূর্যপ্রতিম বলীয়ান — 'হে পূষন্, সংহরণ করিয়াছ তব রশ্মিজাল,/এবার প্রকাশ করো তোমার কল্যাণতম রূপ,/দেখি তারে যে পুরুষ তোমার আমার মাঝে এক' (৯সংখ্যক কবিতা, "প্রান্তিক")। 'মৃত্যু-গুহা' থেকে ফিরে নতুন আলোয় নেমে কবির মনে হয় — কোনো এক অন্যযুগের অজানিত মানুষ ছিলেন তিনি — জন্মান্তর ঘটেছে তাঁর — মনে হয় প্রাচীন তীর্থযাত্রীর মতো এতদিন উজানস্রোতে ভেসে ভেসে হঠাৎ যেন পৌঁছে গেছেন বর্তমান শতাব্দীর ঘাটে। মৃত্যু যেন পুরনো দুর্গদ্বারের অর্গল খুলে তাঁকে অবমুক্ত করে আনে নতুন আলোয় — নির্মোক উন্মোচিত নতুন সত্তারূপে—

– মনে ভাবি,
পুরানোর দুর্গদ্বারে মৃত্যু যেন খুলে দিল চাবি,
নূতন বাহিরি এল ; তুচ্ছতার জীর্ণ উত্তরীয়
ঘুচালো সে; অস্তিত্বের পূর্ণ মূল্যে কী অভাবনীয়
প্রকাশিল তাঁর স্পর্শে, (১৫সংখ্যক কবিতা, *প্রান্তিক*)

কবির চেতনাবচেতনের রহস্যজনিত অভিজ্ঞতা এবং পুনর্জীবনলাভের উপলব্ধি অভিনব। তবে একথা স্পষ্ট যে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে তাঁর নবোদ্ভূত দেহ ও মনে কবি লাভ করেন মৃত্যু-অতিক্রমী এক প্রেরণা — ক্রমে তা পরিণত হয় দৃঢ় দর্শনে। 'প্রান্তিক' রচনার অব্যবহিত পরে নববর্ষের (১৩৪৫) ভাষণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুনর্জীবনলাভের স্মৃতি রোমন্থন করেন এবং প্রকৃতির মধ্য দিয়ে নবলব্ধ দর্শনকে ব্যাখ্যা করেন —

> জীবনে অনেক কর্ম করেছি, সুখ দুঃখ ভোগ অনেক হয়েছে; এখন যদি ইন্দ্রিয়শক্তি ক্লান্ত হয়ে থাকে তবে অধ্যাত্মলোক বাকি আছে; আমাদের যে-শক্তি ক্ষুধাতৃষ্ণার দিকে আসক্তির দিকে আমাদের গুহাবাসী জন্তুটাকে তাড়না করে তা যদি ম্লান হয় তবেই আশা করি অন্তরের দিক থেকে মনুষ্যত্বের সিংহদ্বার খোলা সহজ হবে। রিক্ততার পথ দিয়েই পূর্ণতার মধ্যে পৌঁছানো যাবে। বোঁটার বাঁধন থেকে ফল খসে যায়, তাতে তাদের ভয় নেই, তাই শাখার আসক্তি তাদের পিছনের দিকে টানে না, নবজীবনের নবপর্যায়ে তাদের বন্ধনমোচন হয়। তেমনি দেহতন্ত্রে প্রাণের আসক্তি যদি শিথিল হয়, তবে তাকে নবজীবনের ভূমিকা বলেই জানব। [প্রভাতকুমার, ১৪১১ : ১০৭]

প্রকৃতির স্বাভাবিক বৃদ্ধির মধ্যে জীবনের এই দর্শনকে উপলব্ধি করে কবির মৃত্যুভয় সম্পূর্ণ তিরোহিত হয় — মৃত্যু সম্পর্কে নিরাসক্ত হয়ে ওঠেন রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে নিজের পূর্বসৃষ্ট সমস্ত রচনার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও সংশয়হীন হন। অথচ *প্রান্তিকের* অব্যবহিত পূর্বেও *শেষসপ্তক* (১৯৩৫) পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বারংবার মৃত্যুচেতন এবং স্মৃতিকাতর।[১] মূলত *প্রান্তিক*-পূর্ব পর্যায়ের সাথে *প্রান্তিক* পর্যায়ের কাব্যের মৌল পার্থক্য হলো রবীন্দ্রনাথের আত্মতা ও বিশ্বজনীনতা। *শেষসপ্তক* পর্যায়ে কবি আত্মচারী তাই স্মৃতিকাতর — নিজের ভুবনে মগ্ন বলেই মহাকালের ইতিহাসে তাঁর এতদিনকার উৎপাদিত পণ্যের হিসাব-নিকাশে ব্যস্ত — কখনো বিমর্ষ, কখনো আশান্বিত — কখনো মৃত্যুভীত কখনো মৃত্যুঞ্জয়ী হবার সাধনায় রত। এ কারণেই এ পর্যায়ের কবিতায় একধরনের 'সৌম্যবিষাদের সুর' বাজে। *প্রান্তিক* পর্যায় থেকে যখন দেহের মধ্যে প্রাণের আসক্তি ঘুচে যায়, তখন কবির মৃত্যুভয় বিলীন হয়। নতুন প্রেরণায় নবজন্মলব্ধ কবি তখন বিশ্বমানবের একজন — নতুন উদ্বোধনমন্ত্রে দীক্ষিত প্রাণ। বিশ্বভাবনাই এ পর্যায়ে নবজাত রবীন্দ্রনাথের উজ্জীবনের অন্যতম প্রবর্তনা। কবির ভাষায়—

জাগে সুন্দর, জাগে নির্মল, জাগে আনন্দময়ী—
জাগো জড়ত্বজয়ী।
জাগো সকলের সাথে
আজি এ সুপ্রভাতে,
বিশ্বজনের প্রাঙ্গণতলে লহো আপনার স্থান —
তোমার জীবনে সার্থক হোক
নিখিলের আহ্বান। ("উদ্‌বোধন", *নবজাতক*)

আরোগ্যলাভের সাথে সাথে *প্রান্তিক* পর্যায়ে নিজের জীবনের মতোই সমস্ত বিশ্বের চেতনাগত পরিণতিও রূপান্তরিত হয় রবীন্দ্র-মানসে। আর একেই তিনি বলেন, 'যথার্থ আরোগ্য', যার দ্বারা অন্তর্মানসের আধ্যাত্মিকতার প্রভাবে সমস্ত বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক সাধিত হয়, জগতে অস্তিত্ব আনন্দময় হয় [রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৯ : ৪০৩]। কিন্তু বিশ্বচেতনা নিয়ে শতাব্দীর যে নতুন ঘাটে কবি অবতরণ করেন, তা এক 'নরকাগ্নিগিরিগহ্বরতট' — সেখানে প্রচণ্ড দুর্যোগে পৃথিবী প্রকম্পিত, আকাশ কালিমামণ্ডিত, সর্বত্র অমঙ্গলধ্বনি সূচিত — চারিদিকে সভ্যতার নামে 'আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা'র দৃশ্য [১৭ সংখ্যক কবিতা, "প্রান্তিক"]। মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পূর্ববর্তী এ সময়ে সমস্ত বিশ্বজুড়ে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর উত্থান এবং তাদের হীনস্বার্থ চরিতার্থতার নেশায় দুর্বল দেশগুলোর প্রতি নির্মম থাবাবিস্তার ছিন্ন ভিন্ন করে দেয় বিশ্বশান্তি ও স্থৈর্য। এই অসভ্য বর্বরতায় বিশ্ববাসীর নিকট সভ্য দেশগুলোর হিংস্র রূপ নগ্ন হয়ে ওঠে। ইংরেজ জাতির ঔদার্য-মানবমৈত্রী-শিষ্টাচার-সদাচারের উপর আজীবন আস্থাবান রবীন্দ্রনাথেরও মোহমুক্তি ঘটে তাদের সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের উৎকট প্রকাশে। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে রচিত *সভ্যতার সংকটে* কবির বিশ্বভাবনা ও উপলব্ধির সংশ্লেষণ গ্রথিত। *সভ্যতার সংকটে* সভ্যদেশ সম্পর্কে কবির এ সময়কার স্বপ্নভঙ্গের স্বীকারোক্তি মেলে —

> যখন সভ্যজগতের মহিমাধ্যানে একান্ত মনে নিবিষ্ট ছিলেম তখন কোনোদিন সভ্যনামধারী মানব-আদর্শের এতবড়ো নিষ্ঠুর বিকৃত রূপ কল্পনা করতেই পারিনি; অবশেষে দেখছি, একদিন এই বিকারের ভিতর দিয়ে বহুকোটি জনসাধারণের প্রতি সভ্য জাতির অপরিসীম অবজ্ঞাপূর্ণ ঔদাসীন্য উগ্র হয়ে উঠল। [রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ৯-১০]

ব্রিটিশদের সাথে ইউরোপ, আমেরিকা এমনকি নব্যযন্ত্রবিকশিত জাপানের হীন বর্বরতা রূঢ় আঘাতে কবির মানবিক হৃদয়কে বিদীর্ণ করে দেয়। ১৯৩৬ থেকে জাপান কর্তৃক চীনের উপর উপর্যুপরি আক্রমণ এবং তাতে ইংল্যান্ডের রাষ্ট্রনীতিকদের হীন সমর্থন স্তম্ভিত করে দেয় কবিকে — মনে করিয়ে দেয় একদিন এই ইংরেজ জাতিই আফিম-জর্জরিত করে আত্মসাৎ করে নিয়েছিল চীনের একাংশকে। আর আজ *Asia for Asia* এই বিশ্বাস প্রচারকারী সভ্যখ্যাত জাপান নিরীহ, সংস্কৃতিকামী চীনা জাতির উপর নির্বিচারে ঝাঁপিয়ে পড়ে। মৃত্যুর লুপ্তিগুহা থেকে ফিরে স্বচ্ছ চৈতন্য নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন বিংশ শতাব্দীর মধ্যবেলায় সভ্যতার ছদ্মবেশহীন আত্মম্ভরী দ্রংষ্ট্রাবিস্তার —

দেখিলাম এ কালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল, সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক গর্জন-অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ-ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণী নদী পার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি। (১৭ সংখ্যক কবিতা, *প্রান্তিক*)

চীনের হ্যাঙ্কাও, সাংহাই, ক্যান্টনে হাজার হাজার মানুষের প্রতি নির্বিচার আক্রমণ, নৃশংস শিশুহত্যা, নাঙকিনে নারীদের ওপর ক্ষমাহীন পৈশাচিক বর্বরতায় উন্মত্ত জাপানী সৈনিকেরা যখন যুদ্ধজয়ের জন্য বুদ্ধের মন্দিরে প্রার্থনা করতে যায়, তখন ঘৃণায় কুঞ্চিত হয়ে ওঠে কবির হৃদয়। যে দয়াময় বুদ্ধের অন্তর ও বাইরের একমাত্র সত্যধর্ম ছিল মৈত্রী ও প্রেম, সেই মহতের নিকট, 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' মন্ত্রে নিষ্ঠুরতার উদ্দেশ্যে জাপানী সৈনিকদের এইরূপ শরণগ্রহণ কবির নিকট দুঃসহ এক ব্যঙ্গ — 'ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে'। কবির ভাষায় —

'যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগল দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে

বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।[২] ("বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি", *পত্রপুট*)

একইভাবে চাটুবাক্যে খ্রিষ্টকে ভোলাতে যারা গির্জায় প্রণত, তাদের উদ্দেশে কবি উচ্চারণ করেন সর্তকবাণী —

স্তূপাকার লোভ
বক্ষে রাখিয়া জমা
কেবল শাস্ত্রমন্ত্র পড়িয়া
লবে বিধাতার ক্ষমা
সবে না দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি, ভক্তির। ("প্রায়শ্চিত্ত", *নবজাতক*)

ইতঃপূর্বে *পত্রপুট*-পর্যায়ে আবিসিনিয়ার প্রতি ইটালির আক্রমণকে উদ্দেশ্য করে কবি *আফ্রিকা* কবিতা রচনা করলেও রবীন্দ্রনাথ মুসোলীনির বিরুদ্ধে কোনো প্রকাশ্য বিবৃতি দেননি। এমনকি *আফ্রিকা* কবিতাটিও অমিয় চক্রবর্তীর পুনঃপুন অনুরোধে লিখিত [জ্যোতির্ময়, ১৯৯৯ : ৮৯]। কিন্তু *প্রান্তিক* পর্যায় থেকে রবীন্দ্রনাথ চেতনাগত দিক থেকে যেন সক্রিয়ভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী[৩], অংশগ্রহণ করেন প্রত্যেকটি বিশ্ব-ঘটনায় — সংগ্রামের আহ্বান জানান দানবরূপী শোষকের বিরুদ্ধে—

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস
শান্তির ললিতাবাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস —
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে। (১৮ সংখ্যক কবিতা, *প্রান্তিক*)

যখন এশিয়ায় চীনকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে ব্যস্ত জাপান, ঠিক একই সময়ে অর্থাৎ ১৯৩৬ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত স্পেনে 'ন্যাশনালিস্ট' এবং 'রিপাবলিকান'দের মধ্যে চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। তাতে অপশক্তির পক্ষে ইন্ধন যোগায় নাৎসী শক্তি। পাঁচলক্ষ স্প্যানিশ পরস্পরাঘাতে প্রাণ হারায় এই যুদ্ধে। পরাজিত হয় গণতন্ত্রকামী বিপ্লবী 'রিপাবলিক' দল। স্পেনের এই মর্মান্তিক ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ বিচলিত করে রবীন্দ্রনাথকে —

যুদ্ধ লাগল স্পেনে;
চলছে দারুণ ভ্রাতৃহত্যা শতঘ্নীবাণ হেনে।
সংবাদ তার মুখর হল দেশ-মহাদেশ জুড়ে,
সংবাদ তার বেড়ায় উড়ে উড়ে
দিকে দিকে যন্ত্রগরুড়রথে
উদয়রবির পথ পেরিয়ে অস্তরবির পথে। ("চলতি ছবি", *সেঁজুতি*)

রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন স্পেনের যুদ্ধ ইংল্যাণ্ডের হীন স্বার্থরক্ষার ষড়যন্ত্র। আর যুদ্ধাবসানকল্পে ইউরোপের ভালোমানুষিও একান্তভাবে স্বার্থসংশ্লিষ্ট। মূলত, প্রত্যেকটি

নাৎসী আক্রমণেই ইঙ্গ-ফরাসি শক্তিজোটের সমর্থন সুস্পষ্ট হয়ে পড়ে। সোভিয়েত-বিরোধিতার কারণেই জার্মানিকে রাশিয়ার প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গড়ে তোলাই ছিল ইঙ্গ-ফরাসি-মার্কিন শক্তির অভিপ্রায়। তাই তারা প্রত্যেকটি ফ্যাসিবাদী বর্বরতার মৌন সমর্থক হয়। যুগে যুগে শোষিতের প্রতি আক্রমণে নিজেদের স্বার্থে শোষক পক্ষের আঁতাতের ঘটনা বিরল নয়। ইউরোপে ১৯৩৮ সালে শোষকদেশসমূহের এমনি ষড়যন্ত্রেই জার্মানির দ্বারা আক্রান্ত হয় সদ্য স্বাধীন দেশ চেকোশ্লোভাকিয়া। ১৯৩৮এর ৩০ সেপ্টেম্বর জার্মানির মিউনিকে বসে চেকোশ্লোভাকিয়াকে আক্রমণের নীল নকশা আঁকে জার্মানি, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালির মতো পরাশক্তি দেশগুলো — স্বাক্ষর করে 'মিউনিক চুক্তি'তে (Munich Agreement)। একবার আত্মক্ষয়ের মধ্য দিয়ে দুর্বলভাবে উঠে দাঁড়ানো পঙ্গু, মুমূর্ষু চেকোশ্লোভাকিয়াকে আবারো আক্রমণের ঘটনায় কবির মনে হয় এ যেন মৃতপ্রায় শব নিয়ে 'শ্মশানের প্রান্ত চর'দের নির্লজ্জ হানাহানি। কবির ভাষায় —

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে দুর্বলের দলিত পিষ্ট-প্রাণ
নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন করিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্ক ধরার অঙ্ক লেপে। ("প্রায়শ্চিত্ত", *নবজাতক*)

এভাবে 'সুদেতনে'র প্রতি লোভ পোষণ করে পুরো চেকরাজ্যকেই উদরস্থ করে জার্মানি। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে শোষিতকে নিয়ে শোষকের এ এক সর্বনাশা দ্যুতক্রীড়া এবং এ খেলার অবসান অবশ্যম্ভাবী —

এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।
বলে যায়, 'দ্যূতচ্ছলে' মানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়। ("জন্মদিন", *সেঁজুতি*)

রবীন্দ্রনাথের এ ভবিষ্যদ্বাণী নির্মমভাবে সত্য হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যপর্যায় থেকে — ইঙ্গ-ফ্রান্স জোটের নিজেদের তৈরি অস্ত্রই যখন বুমেরাং হয়ে আঘাত করে তাদের। শক্তিমদমত্ততায় অন্ধ, নির্বিবেক নাৎসী শক্তির বর্ধিষ্ণু ক্ষুধার শিকারে পরিণত হয় পরিচিত মৈত্রীশক্তি। তারপর কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের মতোই পৃথিবী জুড়ে সংঘটিত হয় আত্ম-পরবিচ্ছিন্ন এক সহিংস প্রলয়। যুদ্ধ অনিবার্য বুঝে কেবল বিশ্বস্বার্থে, সাম্রাজ্যবাদ নিরসনে রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অপরিণামদর্শী মৈত্রীশক্তিকে সমর্থন জানান।

প্রান্তিক পর্যায়ে বিশ্বযুদ্ধের অরাজকতার ধ্বনি ও চিত্র নির্মাণে রবীন্দ্রনাথের ভাষা বৈপ্লবিক — কুচকাওয়াজের পদক্ষেপে অগ্রসরমান, দৃশ্যরূপ প্রায়শই সম্প্রকাশধর্মী ও প্রতীকী। বিশ্বের মুমূর্ষু জাতির উচ্ছিষ্ট ভোজে নেমে আসা গর্বোদ্যত উচ্ছিষ্টভোজীদের তিনি চিহ্নিত করেন কুকুর, দানব, পিশাচ আর শকুনিরূপে — ছিন্নমস্তার পৌরাণিক রূপকল্পে চিত্রিত করেন রক্তপায়ী সাম্রাজ্যবাদীদের —

রক্তমাখা দন্ত পঙ্‌ক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগর গ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ভিন্ন করে,
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
... ...
শ্মশানবিহারবিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা,
শতস্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান। (২১ সংখ্যক কবিতা, *জন্মদিনে*)।

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট থেকে নিজের জন্মভূমির দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপলব্ধি করেন সেও ঔপনিবেশিক শাসনের শৃঙ্খলে আবদ্ধ — ইংরেজদের পদানত, নিরুপায়, আশাহত এক জাতি। কবি পৃথিবীর শৃঙ্খলমুক্ত দেশগুলোর উন্নয়নের দিকে তাকিয়ে নিজেদের বন্দিত্ব ও অনগ্রসরতাকে উপলব্ধি করেন। প্রাচ্যবাসী জাপান ইংল্যাণ্ডের প্রযুক্তির দৃষ্টান্তেই কত দ্রুত শক্তিশালী ও সম্পদবান হয়ে ওঠে, তুরস্ক ইউরোপীয় শাসনমুক্ত হয়ে নিজেদের আত্মবিকাশে উদ্যমী হয়, নাৎসী শক্তিদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত যুদ্ধ করেও সোভিয়েত রাশিয়া স্বজাতির শিক্ষা ও আরোগ্য বিস্তারে বিপ্লবী। অথচ ভারতবর্ষ আজও অনুন্নত, সমস্ত দিক দিয়ে পশ্চাৎপদ। কবি মনে করেন, এর মূল কারণ আমাদের পরাধীনতা — 'ইংরেজ শাসনের দ্বারা সর্বতোভাবে অধিকৃত ও অভিভূত ভারত'। [রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ১২] সভ্যতার নামে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে হরণ করে রেখে তার উপর Law and Order বিধি চালিয়ে সম্পূর্ণরূপে পঙ্গু করে নিজের লোভ চরিতার্থ করতে ব্যস্ত ইংরেজ সরকার। দূর দূরান্তে সিংহাসনে বসে যে রাজা তার প্রজাদের পদানত রেখে ক্ষুধা, দারিদ্র্য আর বিকারের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করে রেখেছে — যে রাজশক্তি ভারতবর্ষকে তার শক্তিরূপ দেখিয়েছে মুক্তিরূপ দেখায়নি — অথচ দীনহীন ভারতবাসীর স্বতঃস্ফূর্ত দাসত্ব যার কাম্য, তার অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের অনিবার্য পতন কামনা করেন কবি—

মহা-ঐশ্বর্যের নিম্নতলে
অর্ধাশন অনশন দাহ করে নিত্য ক্ষুধানলে,
শুষ্কপ্রায় কলুষিত পিপাসার জল,
দেহে নাই শীতের সম্বল,
অবারিত মৃত্যুর দুয়ার,
নিষ্ঠুর তাহার চেয়ে জীবন্মৃত দেহ চর্মসার
শোষণ করিছে দিনরাত
রুদ্ধ আরোগ্যের পথে রোগের অবাধ অভিঘাত
সেথা মুমূর্ষুর দল রাজত্বের হয় না সহায়,
হয় মহা দায়।
এক পাখা শীর্ণ যে পাখির

ঝড়ের সংকট দিনে রহিবে না স্থির,
সমুচ্চ আকাশ হতে ধুলায় পড়িবে অঙ্গহীন —
অভ্রভেদী ঐশ্বর্যের চূর্ণীভূত পতনের কালে
দরিদ্রের জীর্ণ দশা বাসা তার বাঁধিবে কঙ্কালে। [২২ সংখক কবিতা, *জন্মদিনে*]

ভারতবর্ষসহ সমস্ত বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিবাদের এই চরম বিস্তারে রবীন্দ্রনাথ চিন্তিত, প্রতিকারপ্রার্থী। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এই চেতনাই রবীন্দ্রনাথের অন্তপর্বের কাব্যের বৈপ্লবিক পরিচয়। রবীন্দ্রনাথ সর্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করেন — শোষিত জাতির এ অবমাননা চিরস্থায়ী সত্য হতে পারে না — সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পতন অবশ্যম্ভাবী — 'প্রবল প্রতাপশালীরও ক্ষমতা মদমত্ততা, আত্মম্ভরিতা যে নিরাপদ নয় তারই প্রমাণ হবার দিন আজ সম্মুখে উপস্থিত হয়েছে।' [রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ১৪]। সর্বোপরি মানুষই পারে সেই বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটাতে। শেষ পর্যন্ত মনুষ্যত্বের পরাভবে তিনি বিশ্বাস করেননি, বলেছেন — 'মানুষের উপর বিশ্বাস হারানো পাপ'। বিশ্বসভ্যতার মরনোন্মত্ততার মধ্যেও কবি প্রত্যক্ষ করেন কিছু দুর্লভ মানবের মহত্ত্ব, দুঃসাহসী প্রতিবাদ — চীনের নাঙকিনে জাপানীদের বর্বর পৈশাচিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী জার্মান ব্যবসায়ী জন রিব, স্পেনের যুদ্ধে আত্মসমর্পণকারী একদল ইংরেজ তরুণ, এন্ড্রুজের মতো মহৎপ্রাণ ইংরেজ এবং যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী লক্ষ লক্ষ স্বাধীনতাকামী মানুষ, যারা মুক্তির জন্য উৎসর্গ করছে প্রাণ। কবি বিপ্লবের আহবান জানান কানাডার তরুণদের—

তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ-ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে।
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।
রক্তে রাঙা ভাঙন-ধরা পথে
দুর্গমেরে পেরোতে হবে বিঘ্নজয়ী রথে,
পরাণ দিয়ে বাঁধতে হবে সেতু। ("আহ্বান", *নবজাতক*)

এই সব বিপ্লব ও খণ্ড খণ্ড মহত্ত্বের ধারাবাহিকতায় একদিন কোনো এক মহামানব পৃথিবীর এ তমাচ্ছন্নতাকে দূর করে, মানুষের অবমাননা ঘুচিয়ে তাকে স্বমহিমায় মুক্তি দেবে — তাঁর অমৃতচেতনায় ধৌত করবে পৃথিবীর সমস্ত কলঙ্ক — এই বিশ্বাসই পোষণ করতেন রবীন্দ্রনাথ —

এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপ যুগের অন্ত হবে,
মানব তাপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নব-সৃষ্টি ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্তমনে —
আজি সেই সৃষ্টির আহবান
ঘোষিছে কামান। (২১ সংখ্যক কবিতা, *জন্মদিনে*)

বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে ফ্যাসিবিরোধী রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সাম্রাজ্যবাদ এবং তার অবসানকল্পেও চিন্তিত। কিন্তু ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তরায় অনেক। তার মধ্যে প্রধান যে কারণ বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, তা হলো ভারতবাসীর মধ্যে 'অতি নৃশংস আত্মবিচ্ছেদ' [রবীন্দ্রনাথ, ১৪১০ : ১২]। এই বিচ্ছেদ একদিকে ধর্মীয় — হিন্দু ও মুসলমানে, অপরদিকে তা প্রাদেশিক — এক প্রদেশের সাথে আরেক প্রদেশের। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এ পর্যায়ে কংগ্রেসই এই প্রাদেশিক দ্বন্দ্বকে ঘনীভূত করে তোলে — বিশেষত সুভাষচন্দ্রের সাথে কংগ্রেসের দ্বন্দ্বের সূত্রে বাংলাদেশের সাথে অন্যান্য প্রদেশের বিচ্ছিন্নতা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ সাল থেকেই জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের ভূমিকা বিভিন্ন কারণে প্রশ্নবিদ্ধ হতে থাকে। কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় রাজনীতিকদের লোভ, অসহিষ্ণুতা, সাম্রাজ্যবাদী তোষণ, আত্মস্বার্থের কারণে যোগ্য নেতৃত্ব সুভাষ বসুর প্রতি প্রতিকূল আচরণ, এমনকি জনসমক্ষে হিটলারের স্তবকীর্তনে রবীন্দ্রনাথ এ পর্যায়ে হয়ে ওঠেন কংগ্রেস-বিমুখ। রবীন্দ্রনাথের তিরস্কারে —

> ভিতরে ভিতরে কংগ্রেসের মন্দিরে এই-যে শক্তিপূজার বেদি গড়ে উঠেছে তার কি স্পর্ধিত প্রমাণ এবারে পাইনি যখন মহাত্মাজিকে তাঁর ভক্তেরা মুসোলীনি ও হিটলারের সমকক্ষ বলে বিশ্বসমক্ষে অসম্মানিত করতে পারলেন? [রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৯ : ৩৭৪]

যে কংগ্রেস একদিন দেশের মানুষের স্বার্থে রাজশক্তির সাথে বচসায় ব্যস্ত থাকত, আজ তারাই রাজদরবারে আমন্ত্রিত জন, আপস উদ্দেশ্যে। আত্মশোষকরূপে কংগ্রেসের এই রূপান্তরকে রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদী চরিত্রের সমগোত্রীয় বলেই মনে করেন — 'ইম্পিরিয়ালিজম্ বলো, ফ্যাসিজম্ বলো অন্তরে অন্তরে নিজের বিনাশ নিজেই সৃষ্টি করে চলেছে। কংগ্রেসেরও অন্তঃসঞ্চিত ক্ষমতার তাপ হয়তো তার অস্বাস্থ্যের কারণ হয়ে উঠেছে বলে সন্দেহ করি।' [রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৯ : ৩৭৩-৩৭৪]। কেবল কংগ্রেসপন্থীদের এই আচরণেই নয়, স্বয়ং গান্ধীজি, দেশরক্ষায় যার মহত্ত্ব ও কীর্তি সম্মানের সাথে আজীবন স্বীকার করেন রবীন্দ্রনাথ, দেশের সংকটকালে তাঁর পুনঃপুন অনশন, লক্ষ্যসিদ্ধির জন্য ভারতবর্ষের নিরীহ মানুষের করুণাবৃত্তির উপর পীড়া সৃষ্টি এবং তাঁর 'আত্মপীড়নমূলক ছেলেমানুষি'র সঙ্গে এ পর্যায়ে একাত্ম হতে পারেননি রবীন্দ্রনাথ। কারণ মহাত্মা গান্ধীর আধ্যাত্মিক কর্মপন্থা চিত্তোৎকর্ষক হলেও ভারতের স্বাধীনতা রক্ষার অবলম্বন হিসেবে তা শেষপর্যন্ত মঙ্গলজনক বলে প্রতীয়মান হয়নি রবীন্দ্রনাথের নিকট —

> আমাদের দেশে আধ্যাত্মিক সাধনা ও কর্মসাধনাকে একাসনে বসানো বিপজ্জনক। .... মহাত্মাজি মাঝে মাঝে যদি চিত্তশোধনের জন্য এই কৃচ্ছসাধনা করতেন তাহলে সেটা ভারতীয় প্রথার সঙ্গে মিলত। .... মহাত্মাজি যখন রাষ্ট্রিক উদ্দেশ্য নিয়ে মাঝে মাঝে অবশনব্রত গ্রহণ করেন তখন সমস্ত দেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে, এতে তাঁর আত্মার কী উৎকর্ষ সাধন হয় আমি বুঝতেই পারিনে— বরঞ্চ ফল উল্‌টো হবারই কথা। [প্রভাতকুমার, ১৪১১ : ১৭৭]

রবীন্দ্রনাথ ভীষণভাবে মর্মাহত হন কংগ্রেস এমনকি গান্ধী কর্তৃক সুভাষচন্দ্রের সুযোগ্য নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থায়, তাঁর প্রতি তীব্র অসহযোগিতায়। রবীন্দ্রনাথ এমনকি মহাত্মাজির আচরণের পেছনে 'একাধিপত্যপ্রিয়তার লোভ'কে ইঙ্গিত করেন এবং কংগ্রেসের এই বৈরিতার বিপরীতে নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দেশের সংকটকালে 'অধিনেতা'রূপে বরণ করে নেন — 'আজ আমি জানি, বাংলাদেশের জননায়কের প্রধান পদ সুভাষচন্দ্রের' [রবীন্দ্রনাথ,

১৪০৯ : ৩৮১]। দুঃখ-বিঘ্ন-পরাভবজয়ী সুভাষচন্দ্রের চারিত্রশক্তি সঞ্চারিত হবে ভারতবর্ষে এই কামনাই করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। [রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৯ : ৩৮৪] সাথে সাথে বাংলাদেশকেও উজ্জীবিত করতে 'মহাজাতি-সনদে'র সাথে একাত্ম হন কবি। [রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৯ : ৩৯১] রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাসেই শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছিলেন যে, 'ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন-না একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে।' [রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৯:৪১৫] নিজেকে 'মহামানবে'র স্তরের বলে মনে করেননি, কিন্তু মহাপুরুষের শক্তি ও সাধনায় আমৃত্যু আস্থাবান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। 'আত্মপরিচয়ে' কবি বলেন — 'শুভ্র নিরঞ্জনের যাঁরা দূত তাঁরা পৃথিবীর পাপক্ষালন করেন, মানবকে নির্মল নিরাময় কল্যাণব্রতে প্রবর্তিত করেন তাঁরা আমার পূজ্য; তাঁদের কাছে আমার আসন পড়েনি [রবীন্দ্ররচনাবলী, ২০০৬ : ১৮৮]। বৈশ্বিক সংকটে যে মহামানবকে ত্রাণকর্তারূপে জেনেছিলেন, হয়তো মৃত্যুর আগে ভারতবর্ষের মুক্তির লক্ষ্যে সুভাষচন্দ্রকেই[৫] সেই মহামানবরূপে অন্তঃকরণে বিশ্বাস করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ —

ঐ মহামানব আসে;
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক —
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমরাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে।
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে। (৬ সংখ্যক কবিতা, *শেষ লেখা*)

একথা সত্য যে *প্রান্তিক* পর্যায় জুড়ে বৈশ্বিক ও দৈশিক পটে রবীন্দ্রনাথের সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মানসিকতা হুবহু মার্কসবাদীদের মতো নয় – কারণ 'শালের কাঠ' এবং 'শালের মঞ্জরি'র প্রকাশ স্বতন্ত্র [সত্যেন্দ্রনাথ, ১৯৯৬ : ৩২৮]। রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সংবেদনা ও বিচারবুদ্ধির সাহায্যে বিশ্বসংকটকে উপলব্ধি করেছেন, প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তার প্রতিকার কল্পনা করেছেন। তবে মরণসমীপে রবীন্দ্রনাথ মরমিয়া নন বরং শোষণ-সচেতন, প্রবলভাবে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী, গণমানুষের প্রতিনিধি এক মানুষ। বিশ্বমানবিকতার এই আত্মিক ও ঐকান্তিক প্রকাশই অন্তপর্বের রবীন্দ্র-কাব্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন।

২

রবীন্দ্র-কবিতার অন্তরাগ কেবল প্রলয় গোধূলির রুদ্র আলিম্পন নয়, বরং মাঝে মাঝে কৌতুকবিভায়, পরিহাসচ্ছটার তরল, দ্রবীভূত এক সায়াহ্নলোক। *প্রান্তিক* পর্যায়ে উপর্যুক্ত নানা বৈশ্বিক সংকটের ভেতরেও গভীরভাবে চিন্তান্বিত রবীন্দ্রনাথ কখনো কখনো সহর্ষে মেতেছেন কৌতুকরঙ্গে। কবির ভাষ্যে —

আমার জীবনকক্ষে জানিনা কী হেতু
মাঝে মাঝে এসে পড়ে খ্যাপা ধূমকেতু —
তুচ্ছ প্রলাপের পুচ্ছ শূন্যে দেয় মেলি,
ক্ষণতরে কৌতুকের ছেলেখেলা খেলি
নেড়ে দেয় গম্ভীরের ঝুটি। ("ভূমিকা", *প্রহাসিনী*)

জীবন-নাট্যের নানা দ্বন্দ্ব ও সংকটের মধ্যেও বিমোক্ষণের আনন্দে কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথ যে তাঁর অন্তঃস্বভাবের স্ফূর্তিতে কৌতুকপ্রবণ হয়েছেন তার দৃষ্টান্ত — *খাপছাড়া* (১৯৩৭), *সে* (১৯৩৭), *ছড়ার ছবি* (১৯৩৭), *গল্পসল্প* (১৯৪১) প্রভৃতি। দিনানুদৈনিক জীবনেও রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ্ম কৌতুকপ্রিয়তার সাক্ষ্য কম নয়। রবীন্দ্রনাথের সায়ংকালীন কৌতুক-কাব্য দুটি *প্রহাসিনী* (১৯৩৯) ও *ছড়া* (১৯৪১)। *প্রহাসিনী* বিংশ শতাব্দীর আধুনিকা নারীদের চরণে নিবেদিত; *ছড়া* বিবিধ বিষয় নিয়ে রচিত।

প্রহাসিনী রবীন্দ্রনাথের অস্তপর্বের বিশ্রম্ভালাপগাথা। এখানে রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রসিকতার উদ্দিষ্টা কখনো আধুনিক কর্মব্যস্ত নারী, যারা সেকালের নারীদের মতো অন্তঃপুরের অসূর্যম্পশ্যা নয় কিংবা পাল্কি-বাহিত জীব নয় বরং প্রয়োজনে দৌড়ে গিয়ে ওঠে মোটরযানে। পরিহাসের সুরে প্রকারান্তরে আধুনিক নারীর এই সম্মুখগতিকে সাধুবাদ জানান রবীন্দ্রনাথ। কবি কালিদাসের কালের 'গজেন্দ্রগামিণী'দের সাথে একালের নারীদের গতিময়তার তুলনা করে 'মেঘদূতে'র পরিবর্তে অধুনা 'বিদ্যুৎ-দূতে'র কল্পনা করেন। পরলোকবাসী কালিদাসকে উদ্দেশ্য করে কবি বলেন —

স্নিগ্ধচ্ছায়া ছিলে যে অতীতে
তেয়াগিয়া তাহা তড়িৎগতিতে
নিতে চাও কভু তীব্র ভাষণ
আধুনিকাদের কবির আসন?
মেঘদূত ছেড়ে বিদ্যুৎ-দূত
লিখিতে পাবে কি ভাষা মজবুত। ("নারী-প্রগতি", *প্রহাসিনী*)

সভ্যতার বিবর্তনে যুগে যুগে নারীর অবস্থান ও পরিবর্তন সম্পর্কে এ পর্যায়ে গভীরভাবে উৎসুক রবীন্দ্রনাথ। তিনি মনে করেন, সভ্যতার নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়েও নারী চলছে তার নিজস্ব নিয়মে — এক প্রশস্ত ধারায় জীবপালিনী সত্তারূপে। পুরুষ যখন প্রতি মুহূর্তে নানা ভাঙাগড়ায় ব্যস্ত, নারী তখন তার প্রকৃতিপ্রদত্ত হৃদয় সম্পদ নিয়ে অধ্যবসায়ী এক সভ্যতার নির্মাণে অক্লান্ত। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নারীসমাজে দেখা দেয় প্রগতি ও চাঞ্চল্য — সংসারের গণ্ডি পেরিয়ে বহির্মুখী হয় তারা। কিন্তু সে রূপান্তর ভাঙাগড়ার কোনো আমূল পরিবর্তন নয় — প্রকৃতির মতোই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় — 'প্রাকৃতিক কারণে নদীতে জলধারার পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তবে তার তটভূমির সীমা আপনিই হটে যেতে থাকে। মেয়েদের জীবনে আজ সকল দিক থেকেই স্বতঃই তার তটের সীমা দূরে চলে যাচ্ছে। নদী উঠছে মহানদী হয়ে।' [রবীন্দ্রনাথ ১৪০৯:৩৬৫], তাই কালধর্মে সনাতন নারীর সাথে আধুনিক নারীর ব্যক্তিত্ব ও জীবনাদর্শে ঘটে যায় ব্যবধান। *প্রহাসিনী*-র "নারীর কর্তব্য" কবিতায় রবীন্দ্রনাথ সনাতনী নারীর দৃষ্টিভঙ্গিতে আধুনিক নারীর এই পরিবর্তনকে চিহ্নিত করেন—

বঙ্গনারী ধরেছে শেমিজ,
বি.এ. এম.এ. পাস ক'রে ছড়াইছে বীজ
যুক্তি-মানা ঘোর ম্লেচ্ছতার।
ধর্ম হল ছারখার।
শীতলামায়ীরে করে হেলা;
বসন্তের টিকা নেয়; গ্রহণের বেলা
গঙ্গাস্নানে পাপ নাশে,
শুনিয়া মূঢ়ের মতো হাসে। ("নারীর কর্তব্য", *প্রহাসিনী*)

বস্তুত এ ব্যঙ্গকবিতার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ এই ব্যক্ত করতে চান যে, মেয়েরা এখন পুস্তক মানে কেবল পঞ্জিকাতেই সীমাবদ্ধ নন, বরং, এম.এ. বি. এ পাশ করে তারা আজ বিজ্ঞানমনস্ক, প্রগতিশীল, সংস্কৃতিকামী। ধ্বংসনেশায় মত্ত সভ্যতার এই পৌরুষ-রূপের অন্তরালে সময়ের প্রয়োজনে স্বাভাবিক লয়ে স্বচ্ছন্দে অর্জিত নারীর এই বিবর্তন অন্তর্নিহিত ছন্দরূপে সভ্যতাকে তার পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে সহায়ক। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন, যুগে যুগে ভাঙা গড়ায় অভ্যস্ত পুরুষ-নির্মিত 'ব্যক্তিহননকারী সভ্যতা'র ভারসাম্যের প্রয়োজনেই এই আধুনিক নারীর আবির্ভাব। এ পর্যায়ে কবি তাই সমস্ত প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে নবযুগের ধ্বংসক্লান্ত সভ্যতার বিনির্মাণে আহ্বান করেন নবীন-নারীদের —

> নবযুগের এই আহ্বান আমাদের মেয়েদের মনে যদি পৌঁছে থাকে তবে তাঁদের রক্ষণশীল মন যেন বহু যুগের অস্বাস্থ্যতার আবর্জনাকে একান্ত আসক্তির সঙ্গে বুকে চেপে না ধরে। তাঁরা যেন মুক্ত করেন হৃদয়কে, উজ্জ্বল করেন বুদ্ধিকে, নিষ্ঠা প্রয়োগ করেন জ্ঞানের তপস্যায়। মনে রাখেন নির্বিচার অন্ধ রক্ষণশীলতা সৃষ্টিশীলতার বিরোধী। [রবীন্দ্ররচনাবলী, ১৪০৯ : ৩৭০]

'প্রহাসিনী' কাব্যের রম্যপত্রগুলি অবগুণ্ঠনমুক্ত এই নব্যনারীদের প্রতি রবীন্দ্রনাথের স্নেহাশিস অঞ্জলিস্বরূপ। এই সময় কালিম্পঙে অবস্থানকালে 'অপরাজিতা দেবী' ছদ্মনামে একজন আধুনিকা রবীন্দ্রনাথের নিকট ছন্দে লেখা এক রম্য সমালোচনা প্রেরণ করেন। কৌতুক-প্রিয় রবীন্দ্রনাথ আধুনিকা নারীর এ কৌতুকের প্রত্যুত্তর জানান ছন্দেই। *প্রহাসিনী*তে "আধুনিকা", "গরঠিকানী", প্রভৃতি রম্যপত্রগুলো এ উদ্দেশ্যেই রচিত। রবীন্দ্রনাথের সেই সরস পদুত্তরে—

বেঠিকানা তব
আলাপ শব্দভেদী
দিল এ বিজনে
আমার মৌন ছেদি ।
দাদুর পদবী
পেয়েছি তাহার দায়
কোনো ছুতো করে
কভু কি ঠেকানো যায়!
স্পর্ধা করিয়া
ছন্দে লিখেছ চিঠি;
ছন্দেই তার
জবাবটা যাক মিটি। ("গরঠিকানি", *প্রহাসিনী*)

লক্ষণীয় যে, কেবল কবিতায় নয় রবীন্দ্রনাথের এ পর্যায়ের ছোটগল্পগুলোতে অঙ্কিত নারী চরিত্রগুলো — যেমন *রবিবারের* 'বিভা', *শেষ কথার* 'অচিরা', *ল্যাবরেটরির* 'সোহিনী' — এরা প্রত্যেকেই অত্যন্ত আধুনিক, শক্তিময়ী ও সপ্রতিভ। প্রকৃতপক্ষে সংসারের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে নারীর ব্যক্তিত্বময়ী আত্মপ্রতিষ্ঠাই এ পর্বে রবীন্দ্রনাথের কাম্য।

*প্রহাসিনী*তে অন্যান্য রম্যপত্র — যেমন দৌহিত্রী নন্দিতা কৃপালনীকে উদ্দেশ্য করে লেখা 'পলাতকা', স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে আগাগোড়া হিন্দিতে লেখা 'নাসিক হইতে খুড়ার পত্র' প্রভৃতি রবীন্দ্রনাথের সহর্ষ হৃদয় উৎসারিত রম্য প্রয়াস। 'অনাদৃতা লেখনী' কবিতায় কবির উপেক্ষিতা লেখনী কালিদাসী নামের এক বিরহিণী নারীরূপে কল্পিত। কবির উদ্দেশ্যে সেই নারীর স্বরবৃত্তে রচিত লেখা অনুযোগ-পত্রটিও দারুন কৌতুকাবহ, রসসিক্ত —

বিনয়সহ এই নিবেদন অঙ্গুলি চম্পাসু,
নালিশ জানাই কবির কাছে, জবাবটা চাই আশু।
যে লেখনী তোমার হাতের স্পর্শে জীবন লভে
অচলকূটের নির্বাসন সে কেমন ক'রে সবে।
বক্ষ আমার শুকিয়ে এল, বন্ধ মসী-পান,
কেন আমার ব্যর্থতার এই কঠিন শাস্তিদান। ("অনাদৃতা লেখনী", *প্রহাসিনী*)।

কবি তাঁর লেখনীর সাময়িক বন্ধ্যাত্বকেও সহজেই এমন উপভোগ্য করে তোলেন। এইরূপে *প্রহাসিনী*তে 'রিলেটিভিটি', 'মিষ্টান্বিতা', 'মাছিতত্ত্ব' 'মাল্যতত্ত্ব' 'মশকমঙ্গলগীতিকা', 'অপাক-বিপাক' প্রভৃতি কবিতার মধ্য দিয়ে বিজ্ঞানের গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব থেকে শুরু করে তুচ্ছ প্রাণী পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের কৌতুকের বিষয় — এমনকি শান্তিনিকেতনের 'চা-স্পৃহা চঞ্চল চাতকদল'কে উদ্দেশ্য করে অনুপ্রাসের আন্দোলনে কবি রচনা করেন 'চাতক' কবিতাটি —

কী রসসুধা — বরষাদানে মাতিল সুধাকর
তিব্বতীয় শাস্ত্র গিরিশিরে!
তিয়াষিদল সহসা এত সাহসে করি ভর
কী আশা নিয়ে বিধুরে আজি ঘিরে। ("চাতক", *প্রহাসিনী*)

*প্রহাসিনী*র মতোই কবির অলস মনের প্রদোষ-উৎসারিত 'টুকরো কথার ঝাঁকে' রচিত খেয়ালী কাব্য *ছড়া*। স্বভাবতই এ কাব্যের ছড়াগুলো স্বরবৃত্ত ছন্দে বাঁধা, মিলপ্রধান, গৌণ অর্থ, শিশুতোষ সৃষ্টি। যেমন—

গলদাচিংড়ি তিংড়িমিংড়ি,
লম্বা দাঁড়ার করতাল,
পাকড়াশিদের কাঁকড়াডোবায়
মাকড়সাদের হরতাল।
পয়লা ভাদর, পাগলা বাদর,
লেজখানা যায় ছিঁড়ে,
পালতে মাদার, সেরেস্তদার
কুটছে নতুন চিড়ে। (৭ সংখ্যক কবিতা, *ছড়া*)

তবে এসব ছড়া সর্বত্রই নিরর্থক পদ্যস্ফূর্তি কিংবা খাপছাড়া কথার প্রলাপ নয়, কখনো কখনো ছড়াগুলো হয়ে ওঠে তীব্র অর্থবোধক, তির্যক, ব্যঙ্গপ্রবণ। নিছক 'হিউমারের' পাশাপাশি সচেতন 'উইট' দুর্লক্ষ নয় এখানে। যেমন—

ওই শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি;
দেশ বিদেশে শহর গ্রামে গলা-কাটার ধুম কী।
খাঁচায় পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে;
সকাল থেকে নাম করে গান, হরে কৃষ্ণ হরে। (৬ সংখ্যক কবিতা, *ছড়া*)

উল্লিখিত রেডিয়োর 'বোঁচা গোঁফে' আর কেউ নয়, স্বয়ং হিটলার — স্বৈরাচারী, সাম্রাজ্যবাদী, বিশ্বশোষক। একইভাবে দেশীয় রাজনীতির অসংগতির প্রতি বিদ্রূপও দুর্লক্ষ্য নয় *ছড়ায়*। এ পর্যায়ে বিপথগামী কংগ্রেসের অসাধুতা এবং দুষ্কৃতির সাক্ষ্যবাহী নিম্নোক্ত পদ্যাংশটি —

রানাঘাট-সমাচারে লিখিছে রিপোর্টার —
আঠারোই অঘ্রাণে শুরু হতে ভোরটার
বেশি বই কম নয় ছয় সাত হাজারে
গুণ্ডার দল এল সবজির বাজারে।
এ খবর একেবারে লুকোনোই দরকার,
গাপ করে দিল তাই ইংরেজ সরকার।
ভয় ছিল কোনোদিন প্রশ্নের ধাক্কায়
পার্লিয়ামেন্টের হাওয়া পাছে পাক খায়।
এডিটর বলে, এতে পুলিশের গাফেলি।
পুলিশ বলে যে, চলো বুঝে সুঝে পা ফেলি;
ভাঙল কপাল যত কপালেরই দোষ সে,
এ-সব ফসল ফলে কনগ্রেসি শস্যে। (৩ সংখ্যক কবিতা, *ছড়া*)

ইংরেজ শাসকের সাথে কংগ্রেসের একাত্মতা ও স্বার্থসংশ্লিষ্টতার বিষয়টি এখানে ব্যঙ্গবিদ্ধ করেন কবি। অর্থাৎ, এ গ্রন্থের ছড়াগুলোর মধ্যে ঋজুতাই প্রধান ধর্ম হলেও সেগুলো সর্বাংশে বক্রতা-বর্জিত নয়। *প্রহাসিনী* এবং *ছড়া* — দুটিই মুখ্যত অন্ত্যমিলের কাব্য, ধ্বনি প্রধান। শব্দালংকারই প্রধান লক্ষ্য। তাই ধ্বনি মাধুর্যের প্রয়োজনে এখানে কবি শব্দ-প্রয়োগে ভ্রূক্ষেপহীন। ভাবানুযায়ী কাব্যদুটিতে সংস্কৃত, দেশি, ইংরেজি, হিন্দি, প্রাকৃত, আঞ্চলিক, সাধু, চলিত এমনকি প্রচুর মিশ্র শব্দ বহুল ব্যবহৃত। যেমন—

ক. 'এ কী গেরো। কাজ কী এ কল্পনা বিহারে,
সেন্টিমেন্টালিটি বলে লোকে ইহারে।
মরে তবু বাঁচিবার আবদার খোকামি,
সংসারে এর চেয়ে নেই ঘোর বোকামি।
এটা তো আধুনিকার সহিবে না কিছুতেই;
এস্‌টিমেশনে তার পড়ে যাব নিচুতেই।
অতএব, মন, তোর কলসি ও দড়ি আন —
অতলে মারিস ডুব মিড্‌-ভিকটোরিয়ান। ("আধুনিকা", *প্রহাসিনী*)

কিংবা

খ. কুকুরের লেজে দেয় ইন্‌জেক্‌শ্যান,
মাস্থলি টিকিট কেনে জলধর সেন।
পাঁজি লেখে, এ বছরে বাঁকা একালটা,
ত্যাড়াবাঁকা বুলি তার উলটা-পালটা —
ঘুলিয়ে গিয়েছে তার বেবাক খবর —
জানিনে তো কে যে কারে দিচ্ছে কবর। (১১ সংখ্যক কবিতা *ছড়া*)

উপরে *প্রহাসিনী* কাব্যের একটি দৃষ্টান্তে কৌতুকোদ্রেকের উদ্দেশ্যে প্রচুর ইংরেজি শব্দ এবং নীচে *ছড়ার* একটি কবিতায় বাংলার সাথে ইংরেজি, ফার্সি ও প্রাকৃত ভাষার বিচিত্র ব্যবহার ভাবানুযায়ী সংগতিসম্পন্ন, সৌষম্যপূর্ণ।

৩.

রবীন্দ্র-কবিতার অন্তরাগের বিমূর্ত রূপটি সবচেয়ে বেশি সম্মোহনীয়। বিজ্ঞান ও উপনিষদের বন্ধনে জীবনের দার্শনিক উপলব্ধিতে, বিষাদ-করুণ অনুভবে তার রং গৈরিক; শুদ্ধ ও কোমলের বৈরাগ্যে মুলতানে বাঁধা তার সুর।

আকাশপ্রদীপ (১৯৩৯) কাব্যে জীবনসন্ধ্যায় উপনীত কবির স্মৃতি রোমন্থনে পুনরাবৃত্ত হয় অতিক্রান্ত জীবনের চিত্র — শৈশবে দিদিমার বালিশের তলায় চাপা থাকা কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রথম আস্বাদন (যাত্রাপথ), স্কুল পালিয়ে পুরনো বাগানের নির্জনতার সঙ্গ লাভের আনন্দ (স্কুল-পালানো), চেনা পৃথিবী ও আকাশের নানা রূপ-রস-ধ্বনির সাথে একাত্মতা (ধ্বনি), জীবনে বধূ-আগমনগাথা (বধূ), তারপর ভূমির নিষেধগণ্ডি পার হয়ে সৃষ্টির পথে অকূল সন্তরণ — পারাপার (জল) এবং দীর্ঘপথের শেষে গিরিশিখরে উন্নীত কবি আজ উপর থেকে প্রত্যক্ষ করেন তাঁর ভূত-ভবিষ্যৎ (পঞ্চমী)। *আকাশপ্রদীপ* কাব্যে কবি তাঁর অন্তলোকের প্রান্তদ্বারে দাঁড়িয়ে আকাশে অসংখ্য স্মৃতির প্রদীপ জ্বালান। মরণকে বঞ্চনা করার ভানে, বাঁচা-মরার খেলায় জেতার উদ্দেশ্যে বার্ধক্যোপনীত নিঃসঙ্গ কবি স্মৃতিকে আকার দেন এক মনে বসে। কিন্তু দীর্ঘজীবনের শেষে *আত্মপরিচয়* (১৯৪২) রচয়িতা কবি উপলব্ধি করেন যে তাঁর এতদিনকার সৃষ্টিগুলো খণ্ড খণ্ডরূপে বিক্ষিপ্ত করেছে তাঁর অভিজ্ঞানকে। পরিণত বয়সে এখন কবি তাঁর বিচিত্র অভিজ্ঞতার ঐক্যসূত্রটিকে আবিষ্কার করতে সক্ষম। নিজের সম্পর্কে লালিত অস্পষ্ট ধারণার অবসানে কবি অনুভব করেন তাঁর 'আমিত্ব'কে —

> জীবনের দীর্ঘ চক্রপথ প্রদক্ষিণ করতে করতে বিদায়কালে আজ সেই চক্রকে সমগ্ররূপে যখন দেখতে পেলাম তখন একটা কথা বুঝতে পেরেছি যে, একটিমাত্র পরিচয় আমার আছে, সে আর কিছুই নয়, আমি কবি মাত্র। আমার চিত্ত নানা কর্মের উপলক্ষে ক্ষণে ক্ষণে নানা জনের গোচর হয়েছে। তাতে আমার পরিচয়ের সমগ্রতা নেই। [রবীন্দ্ররচনাবলী, ২০০৬ : ১০৮)

মংপু পাহাড়ের চূড়ায় মেঘের আসা-যাওয়া দেখতে দেখতে কবি উপলব্ধি করেন মহাকালের সৃষ্টি-লয়ের খেলায় কেউ অমর নয়, কোনো কিছু শাশ্বত নয় — মৃত্যু মানে নবজন্মের

ভূমিকা — শূন্যতা থেকেই নতুন সৃষ্টি। কবি জানেন, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে রবিঠাকুরের পালার অবসান হলেও নির্বিকারে চলবে মহাজগৎ — মন্থর হবে না ভাঙা-গড়ার খেলা। কবির ভাষায় —

রবিঠাকুরের পালা শেষ হবে সদ্য,
তখনো তো হেথা এক অখণ্ড অদ্য
জাগ্রত রবে চির-দিবসের জন্যে
এই গিরিতটে, এই নীলিম অরণ্যে।
তখনো চলিবে খেলা নাই যার যুক্তি —
বার বার ঢাকা দেওয়া, বার বার মুক্তি।
তখনো এ বিধাতার সুন্দর ভ্রান্তি —
উদাসীন এ আকাশে মোহন কান্তি। ("মংপু পাহাড়ে", *নবজাতক*)

মংপুতে বসে রেডিয়োতে ভেসে আসা বিদেশিনী-কণ্ঠের গান শুনতে শুনতে কবির মনে হয় — এই গান দেশ-কাল-যুদ্ধ-বিগ্রহের ঊর্ধ্বে এক নিরাসক্ত সংগীত — ঠিক যেমন মেঘদূত — বাণীমূর্তিরূপে একা — সেকালের সেই উজ্জয়িনীর উচ্ছল জীবনতরঙ্গ আর নেই, কালিদাস বিগত — শুধু তার নিঃসঙ্গ বিরহ-গাথাখানি বর্তমান ("সাড়ে নটা", *নবজাতক*)। কবি দুঃখ পান কালের করাল গ্রাসে হতঐশ্বর্য রাজপুতানার ভগ্নজানু বীরের মতো মহিমাহীন ধূলিশয়ানে ("রাজপুতানা", *নবজাতক*), হিন্দুস্থানের প্রেতশীর্ণ ধ্বংস্তূপ পরিণতিতে ("হিন্দুস্থান", *নবজাতক*)। কবির মনে হয়, তাঁর হৃদয়ও এমনি এক ভাগ্যরাজ্য — যেখানে পুরনো কালের স্মৃতি, পুরনো অনেক আপনজন, পুরনো বহু অসমাপ্ত আকাঙ্ক্ষার ভগ্নশেষ পড়ে আছে —

আমার এ ভাগ্যরাজ্যে পুরনো কালের যে প্রদেশ,
আয়ুহারাদের ভগ্নশেষ
সেথা পড়ে আছে
পূর্ব দিগন্তের কাছে।

নিঃশেষ করেছে মূল্য সংসারের হাটে,
অনাবশ্যকের ভাঙ্গা ঘাটে
জীর্ণ দিন কাটাইছে তারা
অর্থহারা।

ভগ্নগৃহে লগ্ন ওই অর্ধেক প্রাচীর,
আশাহীন পূর্ব আসক্তির
কাঙাল শিকড়জাল
বৃথা আঁকড়িয়া ধরে প্রাণপণে বর্তমান কাল। ("ভাগ্যরাজ্য", *নবজাতক*)

কখনো কবির মনে হয় জীবনটা একটা 'ইস্টেশন' — যাওয়া আর আসার অনিত্যতা মাত্র। ঠিক এইভাবে মানুষ একদিকে সৃষ্টি করে চলে তার বিচিত্র জগৎ — হাসি-আনন্দ-দুঃখ, অপরদিকে বিশ্বস্রষ্টা বিপরীত ছন্দে মুছে দিতে থাকে সেই সবকিছু। স্টেশনে বসে কবি অন্তর্দৃষ্টিতে মানব-জীবনের এই চির রূঢ় গতায়াতের ছন্দটি উপলব্ধি করেন —

দুবেলা সেই এ সংসারের
চলতি ছবি দেখা, এই নিয়ে রই যাওয়া-আসার
ইস্টেশনে একা।
এক তুলি ছবিখানা এঁকে দেয়,
আর তুলি কালি তাহে মেখে দেয়।
আসে কারা এক দিক হতে ওই,
ভাসে কারা বিপরীত স্রোতে ওই। ("ইস্টেশন", *নবজাতক*)

জন্মদিনে পরিজনবেষ্টিত কবি অর্ঘ্যমাল্যে ভূষিত হয়েও জানেন যে, বিশ্বরূপকারের .হাতে তিনি এক মৃৎসৃষ্ট খেলনা ছাড়া কিছু নন — তাঁর সমস্ত কীর্তি ও মহত্ত্ব অমরত্বের ভানমাত্র। এ পর্যায়ে বিজ্ঞানমনস্ক কবি উপলব্ধি করেন, কীর্তির সমস্ত নশ্বরতার মধ্যে একমাত্র অক্ষয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডলোক। তার ধ্বংস ও সৃষ্টির উৎসব অনিঃশেষ। তার মহাশূন্যে অজানা গ্রহ-নক্ষত্র কেন্দ্রকে ঘিরে সদা ভ্রাম্যমান — মহাকাল নানা রূপান্তরে নিত্য ধাবমান। এই অব্যক্ত বিশ্ব ও অনির্ণেয় কালের মধ্যে মানুষও এক ক্রীড়নক মাত্র। কিন্তু কবির মতে, এই বিশ্বসৃষ্টি ও নভোমণ্ডলের সাথে মানুষ নিতান্ত সম্বন্ধহীন নয়, বরং বিশ্বপ্রকৃতি ও সৃষ্টির সঙ্গে একাত্মতাতেই মানুষের আনন্দ। রবীন্দ্রনাথ নিজেকে মনে করেন 'আবিঃ দেবতা'র দূত, যার দ্বারা পরিবৃত সমস্ত বৃক্ষ ও প্রাণীকুল — বিশ্বপ্রকাশের আনন্দই যার উদ্দেশ্য (রবীন্দ্ররচনাবলী, ২০০৬ : ১১৮)। তাই চিরকাল উপনিষদের বাণীতে আস্থাবান কবি মনে করেন মহাশূন্য কেবল শূন্য নয় — আকাশ যদি আনন্দময় না হতো, তবে জড়ত্বের অবসান হতো অসম্ভব। কবির ভাষায় —

শূন্য, তবু তো শূন্য নয়।
তখন বুঝিতে পারি ঋষির সে বাণী
আকাশ আনন্দপূর্ণ না রহিত যদি
জড়তার নাগপাশে দেহমন হইত নিশ্চল।
কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ
যদেশ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ। (৩৬ সংখ্যক কবিতা, *রোগশয্যায়*)

ঋষিমন্ত্রে বিশ্বাসী রবীন্দ্রনাথ জানেন — বিশ্বস্রষ্টার অর্ধেক শক্তি দিয়ে নির্মিত এই পৃথিবী, বাকি অর্ধেক অপ্রত্যক্ষ, বস্তুতীত — সেখানেই বিশ্বজগতের সাথে মানবের লীলা চলে — সেখানেই কবিত্ব। [রবীন্দ্ররচনাবলী, ২০০৬ : ১৯২]। বিশ্বরহস্যের সাথে একাত্মতাই মানুষের নশ্বর জীবনের আনন্দ ও সৃষ্টিশীলতা বলে মনে করেন রবীন্দ্রনাথ। যে এই আনন্দের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারে সেই হতে পারে জরাজয়ী, বিঘ্নঅতিক্রমী, জীবনপিপাসু। বিশ্বসৃষ্টির এই অপার রহস্যের অমৃত পানে পুষ্ট কবির সত্তা ও চৈতন্য। কবির ভাষায় —

জীবনের দুঃখে শোকে তাপে
ঋষির একটি বাণী চিত্তে মোর দিনে দিনে হয়েছে উজ্জ্বল —
আনন্দ-অমৃত রূপে বিশ্বের প্রকাশ
ক্ষুদ্র যত বিরুদ্ধ প্রমাণে

মহানেরে খর্ব করা সহজ পটুতা।
অন্তহীন দেশকালে পরিব্যাপ্ত সত্যের মহিমা
এ জগতে জন্ম তার হয়েছে সার্থক। [২৫ সংখ্যক কবিতা, *রোগশয্যায়*]

এ পর্যায়ে ভারতীয় দর্শনের সাথে বিজ্ঞান-চেতনার অন্বয়সূত্রে কবি জড়বিশ্বের সাথে মনোবিশ্বের ঐক্য কল্পনা করেন। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে আত্মতত্ত্বের সাথে সমন্বিত করে অসীমকে উপলব্ধি করার প্রেরণা অনুভব করেন কবি—

> যে বিশ্বজালে অচিন্তনীয় দূর নীহারিকার সঙ্গে আলোকসূত্রে বোনা আমার অস্তিত্ব, আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ধরা দিয়েছে তার টানে, সে আমাকে নিয়ে চলেছে সেই অপরিসীম রহস্যের দিকে যার মধ্যে জীবন-মরণের তাৎপর্য রয়েছে প্রচ্ছন্ন, সেই তাৎপর্যের মধ্যে রয়েছে কোনো একটা চিরন্তন অর্থ — যে অর্থ বহন ক'রে চলেছে অসীমের অভিমুখে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড। [প্রভাতকুমার, ১৪১১ : ১৬২]

বিজ্ঞান অধ্যয়ন এবং *বিশ্বপরিচয়* রচনার সূত্রে কবি জানেন তিনি যে গ্রহে বাস করেন তা মহাশূন্যের কোনো বিচ্যুত নক্ষত্রের ক্রমশ শীতলীভূত রূপ। ফলে সৌরমণ্ডলীর সাথে কবি তাঁর সত্তার নৈকট্য অনুভব করেন। মহাশূন্যের দিকে তাকিয়ে কবি প্রত্যক্ষ করেন — সূর্যকে কেন্দ্র করে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর অবিরাম ঘূর্ণন। একই দৃশ্য কবি কল্পনা করেন নিজের জীবনে — সেখানে কবির 'আমিত্ব'কে ঘিরে সদা প্রদক্ষিণরত তাঁর জীবন, স্মৃতি, অনুভববৈচিত্র্য। আর এই জীবনাবর্তনের মধ্য দিয়ে মন্থিত হয়ে ওঠে কবির 'আমিত্ব'। তাঁর কল্পনায় —

চতুর্দিকে বহ্নিবাষ্প শূন্যাকাশে ধায় বহু দূরে,
কেন্দ্রে তার তারাপুঞ্জ মহাকাল-চক্রপথে ঘুরে।
... ...
কোন অজানারে ঘিরি এই অজানার নিত্য গতি।
বহুযুগে বহুদূরে স্মৃতি আর বিস্মৃতি-বিস্তার,
যেন বাষ্প পরিবেশ তার
ইতিহাসে পিণ্ড বাঁধে রূপে-রূপান্তরে।
'আমি' উঠে ঘনাইয়া কেন্দ্র-মাঝে অসংখ্য বৎসরে।
সুখদুঃখ ভালো মন্দ রাগ দ্বেষ ভক্তি সখ্য স্নেহ
এই নিয়ে গড়া তার সত্তাদেহ;
এরা সব উপাদান ধাক্কা পায়, হয় আবর্তিত,
পুঞ্জিত, নর্তিত। ("প্রশ্ন", *নবজাতক*)

রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় মহাপৃথিবীতে মানুষও জ্যোতিষ্করূপী। নক্ষত্রমণ্ডলীর মধ্যে যেমন কিছু নক্ষত্র দীপ্তিমান, কিছু নিষ্প্রভ, কিছু মৃত, তেমনি জীবজগতেও মানুষ 'দীপ্ত নক্ষত্রের মতো আপন প্রকাশশক্তি বিকীর্ণ করছে। এই শক্তি তার ভাষার মধ্যে।' [রবীন্দ্ররচনাবলী, ২০০৪ : ৫৯৮]। সে ভাষা প্রকাশের সামর্থ্যে সবাই সমকক্ষ নয়; কবিরাই অগ্রগণ্য। কারণ মানবজগতে কবিরাই স্রষ্টার অধিকাংশের রূপ দেন — বিশ্বপ্রকৃতির রূপ ও ছন্দ নির্মাণ করেন — ভাষা ও প্রাণের যোগে একাত্ম হন বিশ্বসৃষ্টির সাথে। রবীন্দ্রনাথের মতে,

সৃষ্টিকর্তার মতো মানুষও লীলাময় কিন্তু বিশ্বসৃষ্টির মতো সে সৃষ্টিও শেষ পর্যন্ত অর্থহীন পরিসমাপ্তিতে পর্যবসিত হয়। কবির উপলব্ধিতে —

বাণীর মুরতি গড়ি
এক মনে
নির্জন প্রাঙ্গণে
পিণ্ড পিণ্ড মাটি তার
যায় ছড়াছড়ি —
অসমাপ্ত মূক
শূন্যে চেয়ে থাকে
নিরুৎসুক।
গর্বিত মূর্তির পদানত
মাথা করে থাকে নিচু
কেন আছে উত্তর দিতে পারে কিছু।
বহুগুণে শোচনীয় হায় তার চেয়ে
এককালে যাহা রূপ পেয়ে
কালে কালে অর্থহীনতায়
ক্রমশ মিলায়। (৯ সংখ্যক কবিতা, *শেষ লেখা*)

ভারতীয় দর্শনের সাথে বিজ্ঞান-চেতনার অন্বয়সূত্রে কবি মহাবিশ্ব ও চেতনাবিশ্বের সাযুজ্য কল্পনা করেন। বিশ্বসৃষ্টির উদ্ভব, বিকাশ ও বিনাশের সাথে কবি সাদৃশ্য অনুভব করেন মানবজীবনের জন্ম ও জন্মাবসানের। আদিম পৃথিবীতে সৃষ্টি ছিল শূন্য আবার এর অন্ত্যেও রয়েছে সীমাহীন শূন্যতা। মানুষের জীবনও জন্ম ও মৃত্যুর শূন্যতায় অবসিত। একইভাবে মানুষের সৃষ্টিকর্মও শূন্য থেকে শুরু হয়ে আবার কালান্তরের শূন্যতায় লয় পায়। বিশ্বসৃষ্টি, মানুষ ও তার সৃষ্টিকর্মের এই অনিত্য রূপ ও পরিণাম চিরন্তন সত্য — রবীন্দ্রনাথ জানেন। কিন্তু এই নিরর্থকতার মধ্যে কিছু কি নেই, যা রয়ে যায় কালান্তরেও — অসংখ্য মৃত নক্ষত্রের মধ্যে একমাত্র ধ্রুবতারকার মতো — এই প্রশ্নই বারবার আবর্তিত হয় রবীন্দ্রনাথের মনে —

জন্মের প্রথম গ্রন্থে নিয়ে আসে অলিখিত পাতা,
দিনে দিনে পূর্ণ হয় বাণীতে বাণীতে।
আপনার পরিচয় গাঁথা হয়ে চলে,
দিনশেষে পরিস্ফুট হয়ে ওঠে ছবি,
নিজেরে চিনিতে পারে
রূপকার নিজের স্বাক্ষরে,
তারপরে মুছে ফেলে বর্ণ তার রেখা তার
উদাসীন চিত্রকর কালো কালি দিয়ে,
কিছু বা যায় না মোছা সুবর্ণের লিপি,
ধ্রুবতারকার পাশে জাগে তার জ্যোতিষ্কের লীলা (৭ সংখ্যক কবিতা, *শেষ লেখা*)

বিশ্বজগতের অনিবার্য ধ্বংসের ভবিতব্য সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের মতামতের সঙ্গে কবি সম্পূর্ণ একমত হতে পারেন না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশ্বজগতের আয়ু ক্রমশ নিঃশেষ হয়ে আসছে

— সূর্যের মরণদশায় পৃথিবী একদিন হয়ে উঠবে অমাময় — জীবের অস্তিত্ব হবে বিলীন। কবি বিজ্ঞানীদের এই মতের সঙ্গে ভারতীয় শাস্ত্রের সমন্বয়ে আগ্রহী।[৬] কবির ভাষায়—

> আমার মনে এই প্রশ্ন ওঠে, সূর্য নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের আরম্ভকালের কথাও তো দেখি অঙ্ক পেতে পণ্ডিতেরা নির্দিষ্ট করে থাকেন। অসীমের মধ্যে কোথা থেকে আরম্ভ হল। অসীমের মধ্যে একান্ত আদি এবং একান্ত অন্তের অবিশ্বাস্য তর্ক চুকে যায় যদি মেনে নিই আমাদের শাস্ত্রে যা বলে, অর্থাৎ কল্পে কল্পান্তরে সৃষ্টি হচ্ছে, আর বিলীন হচ্ছে, ঘুম আর ঘুম-ভাঙার মতো। [রবীন্দ্ররচনাবলী, ২০০৪ : ৫৯০] ।

কিন্তু অজ্ঞেয় 'অসীম' সম্পর্কে কবি উৎসুক। সৃষ্টির অন্তে সবকিছুই শূন্য — এই অর্থহীন পরিণতির অখণ্ডনীয় সত্য মানতে কবি অপারগ। মানব-অস্তিত্বের এই বিকাশ ও পরিণামের সাথে কবি তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তার বিবর্তনকে সমান্তর কল্পনা করেন এবং উভয়ক্ষেত্রেই আদি-অন্তহীন পরিণতি কবিকে প্রশ্নাকুল করে তোলে। 'রূপনারাণের কূলে' জেগে উঠে কবি এই সত্যেরই সন্ধান করেছেন, 'সত্তার নতুন আবির্ভাবে' এবং অন্তিমে 'পশ্চিমসাগরতীরে' দাঁড়িয়ে কবি এই প্রশ্নেরই উত্তর সন্ধান করেছেন —

প্রথম দিনের সূর্য
প্রশ্ন করেছিল
সত্তার নূতন আবির্ভাবে —
কে তুমি।
মেলেনি উত্তর
বৎসর বৎসর চলে গেল,
দিবসের শেষ সূর্য
শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিমসাগরতীরে,
নিস্তব্ধ সন্ধ্যায় —
কে তুমি
পেলনা উত্তর। (১৩ সংখ্যক কবিতা, *শেষ লেখা*)

কিন্তু এ প্রশ্নের উত্তর বর্তমানের কবির কাছে চিরকালই অনির্ণেয় ; বিজ্ঞানীদের অনুসিদ্ধান্তও আপেক্ষিক। কারণ কালান্তরের সাক্ষী কেউ হতে পারে না। অজ্ঞেয় সৃষ্টি ,অসীম শূন্য, অনির্ণেয়কাল — এর মধ্যে একটি মানবসত্তা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুবিন্দুর মতো। কিন্তু সাধারণ মানুষ মহাকালের এই অমোঘ ছলনা সহ্য করে শান্তি পেলেও, প্রবল 'আমিত্ব' নিয়ে কবি তো মানতে পারেন না এই অর্থহীন বঞ্চনা। সহস্র আঘাত, বেদনা, আমৃত্যু দুঃখের তপস্যায় অর্জিত কবির চৈতন্য, সৃষ্টিকর্ম, মহত্ত্বের গৌরব সমস্ত বিলীন হবে 'মৃত্যুর নিপুণ শিল্পে' — জীবনব্যাপী এতবড় প্রবঞ্চনা কবির পক্ষে অকল্পনীয়। যে জ্যোতিষ্ক থেকে পৃথিবীর জন্ম, যার জ্যোতি তিলে তিলে মানুষের চৈতন্যের উদ্ভাসন ঘটিয়েছে, সেই জ্যোতিষ্কই হবে চৈতন্যের অপহারক[৭] — এ সত্য কবির নিকট এক নিষ্ঠুর উপহাস। সর্বোপরি যে 'প্রাণস্য প্রাণং', যাকে কবি বলেছেন 'জীবনদেবতা' — কবির মধ্যকার সেই গূঢ় সত্তা, যা দিনে দিনে তাঁর আপন শক্তির দ্বারা পর্বে পর্বে নানা প্রেরণায় নানা সৃষ্টির একটি উৎকর্ষে উপনীত করেছে কবির চৈতন্যকে, তাও এক মস্ত ছেলেখেলা — এ সত্য

আবিষ্কার কবির পক্ষে রূঢ় আঘাত। তাই তাঁর অন্তিম অভিযোগ — হয়তো একই সাথে দুই স্রষ্টার প্রতি — বিশ্বস্রষ্টা ও 'জীবনদেবতা' — উভয়েই প্রতি — জীবন ও সৃষ্টির অনর্থক অন্যায় অপচয় ঘটানোর জন্য —

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছে নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্তেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি।
তোমার জ্যোতিষ্ক তারে
যে-পথ দেখায়
সে যে তার অন্তরের পথ,
সে যে চিরস্বচ্ছ,
সহজ বিশ্বাসে সে যে
করে তারে চিরসমুজ্জ্বল। (১৫ সংখ্যক কবিতা, *শেষ লেখা*)

কবির বিশ্বাস কালের পরিবর্তিত গতির সাথে সাথে অনেক প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অনেক সাহিত্যসৃষ্টি হয়েছে বিস্মৃত, কিন্তু তাঁর সমস্তই সম্পূর্ণরূপে বিলীন হবার নয় — কবির বিশ্বাস, অতীতের অনুসরণ ব্যতীত কেবল সম্মুখের পথে অগ্রসর হওয়ার প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক, অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় —

> অনেক আছে কালের সঙ্গে তাদের মিল ভাঙেনি। আজ নূতনও তাদের দাবি করে, পুরাতনও তাদের ত্যাগ করেনি। কি শিল্পকলায়, কি সাহিত্যে যদি তার যথেষ্ট প্রমাণ না থাকত তাহলে বলতে হতো, সৃষ্টিকর্তা মানুষের মন আপন পিছনের রাস্তা ক্রমাগত পুড়িয়ে ফেলতে ফেলতে চলেছে। কথাটা তো সত্য নয় মানুষ সামনের দিকে যেমন অগ্রসরণ করে তেমনি অনুসরণ করে পিছনের, নইলে তার চলাই হয় না। পিছনহারা সাহিত্য বলে যদি কিছু থাকে সে কবন্ধ, সে অস্বাভাবিক [প্রভাতকুমার, ১৪১১ : ১৯২]

বিজ্ঞানীরা যেখানে এসে থামেন, জগৎ ও জীবনের যে রহস্য তাদের অনাবিষ্কৃত, তাই কল্পনা করতে চেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায়।[৮] আসন্ন মৃত্যুর অন্তিমে কবি এই বিশ্বাসে স্থিতধী হয়েছেন যে, মহাকাল যতই রূঢ় হোক, তা মুছে দিতে পারে না মানুষের সমস্ত চৈতন্যকে। কিছু তার অবশিষ্ট রইবে কালান্তরের পাতায়, স্বমহিমায়। সহস্র আঘাতের মধ্য দিয়ে অর্জিত তাঁর সত্য-কঠিন উপলব্ধি, আমৃত্যু অসংখ্য দ্বন্দ্বের অন্তরালোক-ধৌত কবির বিশুদ্ধ চৈতন্য ব্যর্থ হবার নয় — এই কবির অন্তিম বিশ্বাস —

সত্যেরে সে পায়
আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে।
কিছুতে পারে না তারে প্রবঞ্চিতে,
পুরস্কার নিয়ে যায় সে

আপন ভাণ্ডারে
অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার। (১৫ সংখ্যক কবিতা, *শেষ লেখা*)

প্রকৃতপক্ষে, *শেষ লেখার* শেষ কবিতাটি বিমূর্ত আবেদনবহ — কবির মনোলোকের অন্য কোনো সংবেদনাও নিহিত থাকতে পারে এর কাব্যভাষায়। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে কবির মানসজগতে একই সঙ্গে কয়েকটি বিষয় আবর্তিত ছিল — প্রথমত দৈশিক পর্যায়ে রাজনৈতিক পরিস্থিতির উত্থান-পতন, দ্বিতীয়ত *বিশ্বপরিচয়* রচনার সূত্রে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও মানবজীবনের ঐক্যসন্ধান, এবং জীবন-মৃত্যুর অপার রহস্য সন্ধান। একজন কবির মনোজগৎ একই সময়ে বিভিন্ন ঘটনা দ্বারা আন্দোলিত হতে পারে — একটি কবিতায় একই সঙ্গে সক্রিয় থাকতে পারে একাধিক অনুভাব। রবীন্দ্রনাথের *শেষলেখার* শেষ কবিতাটিও তেমনি একটি কবিতা। হতে পারে আলোচিত প্রসঙ্গ ব্যতীত অন্য কানো ভাব রয়েছে এর মর্মে। হতে পারে কবির অভীষ্ট 'মহামানব' সুভাষ বসুর অনাকাঙ্ক্ষিত অজ্ঞাত-প্রয়াণে বিশ্বাস ও আশাভঙ্গের বেদনায় মর্মাহত কবি। কারণ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর (৭ আগস্ট, ১৯৪১) মাত্র কয়েকমাস পূর্বে ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি সুভাষচন্দ্রের সেই রহস্যজনক 'মহানিষ্ক্রমণ' ঘটে। এই ঘটনায় কবির প্রভাবিত ও আশাহত হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবিক। তবে, পূর্বাপর বিবেচনায় প্রথম ব্যাখ্যাটিই অধিকতর গ্রহণযোগ্য — অর্থাৎ সৃষ্টি-ধ্বংসের বাস্তবতায় কালান্তরের ইতিহাসে কবির অমরত্ব আকাঙ্ক্ষাই প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথের শেষ পর্বের কবিতার অন্যতম প্রধান অন্তর্নিহিত ভাব।

সবমিলে *প্রান্তিক* থেকে *শেষ লেখা* পর্যন্ত রবীন্দ্র-কবিতার অস্তগামী সৌন্দর্য বিচিত্র অভিব্যক্তিতে বর্ণিল — কখনো বিক্ষুব্ধ-বিশ্বের মারণোৎসবে তার দীপ্তি প্রখর, সচকিত, বহ্নিমান; কখনো বিমোক্ষণের শ্রান্তিতে নম্র, সহাস্য, দিগন্ত-উদ্ভাসিত এবং অবশেষে ঋজু সৌম্য বৌদ্ধিক কান্তিতে ক্রমশ বিলীয়মান । সায়ন্তনী সূর্যের এই বর্ণনান্তরিত অভিব্যক্তিতে বাঙ্ময় অস্তপর্বের রবীন্দ্রকাব্য এক অপার বিস্ময়; এক অনির্বাণ উষালোক।

টীকা

১. *শেষসপ্তক* পর্যায়ের সেই বিমর্ষভাবনাটি প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে —

> জীবন-আকাশের আলো ম্লান হয়ে এসেছে — এখন মনের সব বিক্ষিপ্ত ভাবনাগুলো যেন গোষ্ঠে ফেরবার মুখে — বাইরের দিকটা অবরুদ্ধ হয়ে আসছে। এই অবস্থায় নিজেকে একলা মনে হয়। এ জন্মের যাত্রাপথের যারা সঙ্গী ছিল তারা অনেকেই নেই — নতুন যারা এসেছে জীবনে শেষপ্রান্তের সঙ্গে তাদের যোগ — এই প্রান্তটি সংকীর্ণ এবং ক্রমেই ক্ষীণতর হয়ে আসছে [রবীন্দ্রনাথ, ১৪০০ : ১০২]।

২. কবিতাটি ১৩৪৪এ রচিত কিন্তু *পত্রপুট* কাব্যে গ্রন্থিত। এর অন্য একটি রূপ *নবজাতক* গ্রন্থে মুদ্রিত আছে। [রবীন্দ্রনাথ, ১৪০৬ : ৭৭]

৩. ইতঃপূর্বে ১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'League against Fascism and War' নামে গঠিত সংঘে রবীন্দ্রনাথকে সভাপতি করা হয়, যার সম্পাদক হন সৌমেন্দ্রনাথ। অন্যান্য সদস্য ছিলেন সাজ্জাদ জাহাঙ্গীর, জবহরলাল নেহরু, ডাংগে, কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়, জয়প্রকাশ নারায়ণ, রঙ্গ প্রভৃতি। [প্রভাতকুমার, ১৪১১ : ৯১]

৪. রবীন্দ্রনাথ সাম্রাজ্যবাদের অবসানকল্পে বৃহত্তর স্বার্থে মিত্রপক্ষের পক্ষাবলম্বন করেন। ইঙ্গ-ফরাসি জোটের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে পূর্বাপর অবহিত ছিলেন কবি। বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর অমিয়চন্দ্রের নিকট লেখা চিঠিতে কবির সে নিরাসক্ত মনোভাব ব্যক্ত হয় —

> দেখলুম দ্বারে বসে ব্যথিত চিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রাপংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া। ... দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকার চিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালির হাঁ করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মানির বুটের তলায় গুড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে, দেখলুম নন-ইন্টারভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে ক'রে দিতে, দেখলুম ম্যুনিক প্যাক্টে নতশিরে হিটলারের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ ক'রে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ইমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনফা তো কিছুই হল না — পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হল দারুণ যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ইংলণ্ড ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক প্রলেপ আর সহ্য হয় না [প্রভাতকুমার, ১৪১১ : ২০৫]।

মিত্রশক্তির প্রতি কোনো মমত্ব নয়, যে কোনো উপায়ে নাৎসিশক্তির পতনই যেহেতু কাম্য, সেহেতু তাঁর বিপরীত পক্ষ সমর্থন করেন কবি।

৫. ১৯৪১ সালের ১৭ জানুয়ারি ইংরেজ সরকারের নজরবন্দি সুভাষচন্দ্র বসুর রহস্যময় অন্তর্ধান ঘটে। এরপর তিনি নিখোঁজ হন। তাঁর এ প্রয়াণ অদ্যাবধি রহস্যজনক [জ্যোতির্ময়, ১৯৯৮ : ১৬১]

৬. রবীন্দ্রনাথের এ ভাবনা সম্পর্কে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্য —

> বিজ্ঞানীদের মতে, কোন একটা দূর সীমানায় বিশ্ব আপনার ক্রমবিস্ফারিত স্ফীতিতে বিদীর্ণ হইয়া বিলুপ্ত হইবে — কবি এ তত্ত্ব মানিতে প্রস্তুত নহেন; ভারতীয় সাধকদের ধ্যানদৃষ্টি অনুসারে সৃষ্টির আদিও নাই অন্তও নাই, আছে কল্প কল্পান্তর, প্রকাশের পর প্রকাশের অনুবর্তন, প্রলয়ের চক্রপথে। [প্রভাতকুমার ১৪১১ : ২২১।

৭. লব্ধ বিজ্ঞানবুদ্ধি থেকে রবীন্দ্রনাথ জানেন যে, জড়বিশ্ব ও মনোবিশ্বের মূলগত উৎস সূর্য, যাকে তিনি বলেন 'সর্বব্যাপী তেজ বা জ্যোতিঃপদার্থ'। সূর্য থেকেই পৃথিবীর জন্ম সূর্যেরই সূক্ষ্মতর বিকাশে সৃষ্ট চৈতন্য বা মন। সূর্যের জ্যোতি নিঃশেষ হয়ে গেলে মানুষের চৈতন্যও অবধারিতভাবে হয়ে যাবে দীপ্তিহীন — এই ভবিতব্য। [রবীন্দ্ররচনাবলী, ২০০৬ : ৫৮৯]।

৮. *বিশ্বপরিচয়ে* রবীন্দ্রনাথ বলেন —

> যাই হোক বিশ্বসৃষ্টি ব্যাপারে এই যে-সব বিপরীত বার্তাবহ ইশারা আসছে বিজ্ঞানীদের পরীক্ষাগারের সেটা হয়তো কোনো-একটা জটিল গণনার ব্যাপারে এসে ঠেকবে। কিন্তু আমরা তো বিজ্ঞানী নই বুঝতে পারিনে হঠাৎ অঙ্কের আরম্ভ হয় কোথা থেকে, একেবারেই শেষই বা হয় কোন্‌খানে। সম্পূর্ণ-সংঘটিত বিশ্বকে নিয়ে হঠাৎ কালের আরম্ভ হল আর সদ্যোলুপ্ত বিশ্বের সঙ্গে কালের সম্পূর্ণ অন্ত হবে, আমাদের বুদ্ধিতে এর কিনারা পাইনে। বিজ্ঞানীরা বলবেন, বুদ্ধির কথা এখানে আসছে না, এ হল গণনার কথা; সে গণনা বর্তমান ঘটনাধারার উপরে প্রতিষ্ঠিত — এর আদি-অন্তে যদি অন্ধকার দেখি তাহলে উপায় নেই। [রবীন্দ্ররচনাবলী, ২০০৪ : ৫৭৫]

রবীন্দ্রনাথ বিশ্বজগতের এই অন্তররহস্যেরই সন্ধানী।

গ্রন্থপঞ্জি

জ্যোর্তিময় ঘোষ, ১৯৯৮। *নায়কের সন্ধানে*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

জ্যোর্তিময় ঘোষ, ১৯৯৯। *রবীন্দ্রবহ্নিলোক ও ঝড়ের পাখিরা*। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, ১৪১১। *রবীন্দ্রজীবনী ও সাহিত্য-প্রবেশক* (চতুর্থ খণ্ড)। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০০। *চিঠিপত্র-৫*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০৬। *পত্রপুট*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০৬। *প্রান্তিক*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০৯। *কালান্তর*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪১০। *সভ্যতার সংকট*। বিশ্বভারতী, কলকাতা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৬। *রবীন্দ্ররচনাবলী*, একাদশ খণ্ড। *ঐতিহ্য সংস্করণ*, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৬। *রবীন্দ্ররচনাবলী*, দ্বাদশ খণ্ড। *ঐতিহ্য সংস্করণ*, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৪। *রবীন্দ্ররচনাবলী*, ত্রয়োদশ খণ্ড। *ঐতিহ্য সংস্করণ*, ঢাকা।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ২০০৬। *রবীন্দ্ররচনাবলী*, চতুর্দশ খণ্ড। *ঐতিহ্য সংস্করণ*, ঢাকা।

সত্যেন্দ্রনাথ রায় (সম্পাদিত), ১৯৯৬। *রবীন্দ্রনাথের চিন্তাজগৎ : সাহিত্যচিন্তা*; রবীন্দ্ররচনা সংকলন। গ্রন্থালয়, কলকাতা।